ইন্দ্রনাথবাবু

জহর সরকার

পুস্তক: ঘটিগরম, প্রকাশক: ইন্দ্রনাথ মজুমদার, সপ্তর্ষি প্রকাশন, ৭ই সেপ্টেম্বর, ২০১৫

আমার মনে পড়ে না কখন এবং কোথায় ইন্দ্রনাথ মজুমদারের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। কেননা আমার মনে হত কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের অংশ হিসেবে তিনি সবসময় উপস্থিত রয়েছেন। তিনি ছিলেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, হাওড়া ব্রিজ বা কলেজ স্ট্রিটের মতো, কলকাতার একটি স্থায়ী অংশ। আমরা কখনও মনে করে বলতে পারব না প্রথম কবে এদের দেখেছিলাম এবং কখন তার আমাদের জীবনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

১৯৬৯ সালে যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে শুরু করেছি তখন কলেজ স্ট্রিটে যাঁরা বই বিক্রি করতেন তাঁদের প্রতি আমাদের মতো ছাত্ররা এক সম্মোহক আকর্ষণ অনুভব করতাম। আমাদের রুচি সকলের সঙ্গে মিলত না, পড়ার অভ্যাস ছিল বিচিত্র। কদাচিৎ আমরা দাঁও মারতাম। কিন্তু টাকার ব্যাপারটা ছিল খুব জরুরি। আমাদের কখনও হাতে কোনও পয়সা থাকত না। কয়েক বছর পরে একটা বাঁধা চাকরি পেয়েই আমি সেই কলেজ ßIরীটে আবার গেলাম এবং দেখলাম যে কোনও সত্যিকারের পুরোনো বইয়ের দোকানি আর নেই। সমস্ত রাস্তা জুড়ে শুধু পাঠ্য-বই বিক্রি হচেছ। কী সাংঘাতিক!

এখানে সেখানে কয়েকটা জায়গায়, ফুটপাথে, কখনও কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, কখনও হ্যারিসন রোডে আমাকে খুঁজে বেড়াতে হচিছল। সেসব জায়গায় কখনও দাঁও মারা সম্ভব ছিল, খুব ভালো বই সস্তায় পাওয়া যাচিছল।

বাংলার কোনও জেলায় চাকরি করতে করতে বহুদিন বাদে যখন একবার কলকাতায় আসতাম, তখন ইন্দ্রনাথবাবুর কাছে আমার যাওয়াটা ছিল অপরিহার্য। খুব কম লোকই পুরোনো প্রকাশনার মূল্য জানতেন। কপাল ঠুকে গিয়েছিলাম রঞ্জন গুপ্ত এবং পুথিপুস্তকে। কিন্তু ভট্টাচার্যকে তাঁর দোকান ছেড়ে আমাকে তাঁর গুদামে, যেখানে পুরোনো বই জলের দরে পাওয়া যাচ্ছিল, নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে রাজি করানো কঠিন ছিল। কিন্তু এইসব সমস্যার মধ্যে আমি দেখলাম ইন্দ্রনাথ ছিলেন একমাত্র নির্ভরযোগ্য মানুষ। তিনি ছিলেন এক তথ্যকোষ, সর্বদা প্রস্তুত। বই বিষয়ে তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসামান্য। কত বিষয়ের ওপর যে তাঁর দখল ছিল। তাঁর দোকানে তাঁর সঙ্গে দেখা করাটা কিছু শিখতে পারার অভিজ্ঞতা মনে হত। যদি কখনও তাঁকে বলতাম সদ্য কেনা এক সুবর্ণজয়ন্তী প্রকাশনার অন্তর্ভূক্ত একটি প্রবন্ধের কথা, তিনি আমাকে একই বিষয়ের ওপর আরেকটি জয়ন্তী-প্রকাশনার কথা এবং সেটি কোথায় পাওয়া যাবে জানাতেন। যদি তাঁকে কোনও একটি বইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করতাম তিনি আরও দুটো বইয়ের নাম বলে তাঁর পুরোনো বইয়ের সংগ্রহ থেকে একটা খুঁজে পেতে বার করে দিতেন। আরও গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে ব্যাপারটা তা হল যে কখনও কখনও তিনি আমাকে নিরস্ত করার জন্য খোলাখুলি বলতেন, 'ওই বইটা কোনও কাজে লাগবে না, আপনি যা চাইছেন তা ওখানে নেই।'

আমি কী চাইতাম? আমরা কী চাই? যদি উত্তর জানা থাকত তাহলে খোঁজাখুঁজি বন্ধ করতাম। ইন্দ্রনাথদা বুঝেছিলেন যে যেসব পাঠক তাঁর কাছে আসতেন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পড়াশোনার বিবর্তন ঘটে যেত।

তাই তিনি কাউকে জোর করতেন না। একটা পর্ব থেকে আরেকটা পর্বে যাওয়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করতেন, তারপর যখন পরবর্তী পর্যায়ের সঙ্গে আমরা পরিচিত হতে শুরু করেছি তখন তিনি আমাদের সেই পর্বের চিন্তাবিশ্বের সন্ধান দিতেন। এর পরে কী আছে সে বিষয়েও মৃদু ইঙ্গিত তাঁর কাছ থেকে আমরা পেতাম। একবার তাঁকে আমি এক চলন্ত 'রেফারেন্স ম্যানুয়াল' (নির্দেশিকার পুস্তিকা) আখ্যা দিয়েছিলাম।

একদিন তিনি আমাকে অবাক করে দিয়ে প্রশ্ন করলেন যে আমার শাশুড়ি তাঁর পটলডাঙা বাড়ির তাকে যা রাখা আছে তা বিক্রি করবেন কি না। আমি স্তম্ভিত! ইন্দ্রনাথদা জানলেন কী করে? তিনি তো কখনও আমার শ্বশুরবাড়িতে যাননি! সেখানে ছিল 'বঙ্গদর্শন' এবং অন্যান্য অমূল্য প্রকাশনা, যেমন 'প্রবাসী, 'মডার্ন রিভিউ', 'ভারতী' ইত্যাদি। একেবারে স্বর্ণখনি! তিনি জানতেন আমিই ছিলাম একমাত্র প্রতিবন্ধক, কারণ এইসব পোকায়-কাটা বই ও পত্রপত্রিকায় সত্যিকারের আগ্রহী ছিলাম শুধু আমি। আমার যদি প্রচুর জায়গা থাকত আমি কদাচ এগুলো যেতে দিতাম না। ইন্দ্রনাথদা কিন্তু আমাকে তাড়া দেননি। আমাকে যথেষ্ট সময় তিনি দিয়েছিলেন। আমাকে বুঝতে হয়েছিল যে এইসব সম্পদের জন্য তৃষ্ণা আমাকে ত্যাগ করতে হবে। কারণ, আমি কখনও এগুলো ভালো করে পড়ার মত সময় পাব না, ওগুলো রাখার মতো বড়ো জায়গাও আমার থাকবে না। আমার শাশুড়ি কিছুটা অনিচ্ছুক ছিলেন, কত পুরুষ ধরে সংগৃহীত এইসব বইপত্র। কিন্তু তিনিও লক্ষ্য করছিলেন যে এগুলো পোকায় কেটেছে এবং প্রতিমাসে ক্রমশ আরও খারাপ অবস্থায় যাচ্ছে।

সুতরাং মন খারাপ নিয়ে তাঁকে আমায় বলতে হল 'যখন আপনি বিক্রি করা মনস্থ করবেন তখন শুধু ইন্দ্রনাথকেই দেবেন। উনি হয়তো ভালো দাম আপনাকে নাও দিতে পারেন, কিন্তু এই সম্পদ যেন সত্যিকারের গ্রন্থপ্রেমিকদের কাছে পৌঁছয় সেটা উনি দেখবেন। এর বেশি আর আমরা কি চাইতে পারি?' শেষপর্যন্ত উনি বইগুলো ইন্দ্রনাথদাকে দিয়েছিলেন আর ইন্দ্রনাথদা একদম ঠিক ঠিক বাড়িতে সেগুলো পৌঁছে দিয়েছিলেন।

চাকরিসূত্রে বর্ধমান থেকে সোজা দিল্লি যেতে হল আমাকে। আমি দেখছিলাম ইন্দ্রনাথদার খোঁজ রাখা আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ছে। মাঝে মাঝে কাজের চাপে অনেকগুলো লম্বা ফাঁক পড়ত তাঁর সঙ্গে আমার দেখা বা কথা হওয়ার। আমাদের মতো লোকের একদিনের জন্য শান্তিনিকেতন যাওয়া বা কলকাতায় তাড়াহুড়োর মধ্যে ঘুরে আসার সুযোগ প্রায় ঘটতই না। সুতরাং এই শহর বা ইন্দ্রনাথ মজুমদারের মতো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে সবসময় যে কোনও পরামর্শের জন্য পাওয়া যেত; তাঁর অভাবনীয় স্মৃতির সঙ্গে চটজলদি রেফারেন্স অথবা কোনও বিষয়ের চর্চায় অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সূত্রের সন্ধান। এমনকি যখন তিনি অসুস্থ তখনও তিনি তাঁর কাজ বন্ধ করেননি।

আমি নিশ্চিত তিনি এখন ঈশ্বরের গ্রন্থাগারটি গড়ে তুলছেন। প্রয়োজনীয় রেফারেন্স বা গ্রন্থনির্দেশিকাগুলো সেখানে থাকছে। গুগল আর ব্যবহার না করার জন্য ঈশ্বরকে বোঝাচেছন। কারণ, ইন্দ্রনাথদার সার্চ-ইঞ্জিন সবসময় অনেক বেশি ভালো। যেন বলছেন;

আমি আছি না!